ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য (1500-1700)

সপ্তদশ শতকের ভারতের বহিরবাণিজ্যের একটি দিক হলো ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য। অষ্টাদশ শতক পর্যন্তপর্যন্ত এই বাণিজ্য অব্যাহত গতিতে চলেছিলও ভারতীয় বণিকদের প্রাধান্য বজায় ছিল। গুজরাটি মুসলিম বণিকরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, জাহাজের মালিকানা ছিল তাদের। মালাক্কা থেকে মালাক্কা এবং পশ্চিমে লোহিত সাগরের বন্দর এডেন, জেদ্দা এবং পারস্য উপসাগরীয় বন্দর মোখার সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্য চলত। আরব সাগরের পরিবহন বাণিজ্য বাণিজ্য ছিল আরব বণিকদের হাতে। চীন ও মালয়ের মধ্যে বাণিজ্য পরিচালনা করত চীনারা, ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রে জাভা ও মালয়ের লোকেরা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখেছিল। ভারতের উপকূলের বণিকরা ছিল হিন্দু, উপকূল বাণিজ্য পরিচালনা করত মুসলমান বণিকরা। ইউরোপীয়রা এই ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের অংশীদার হয়েছিল। ষোড়শ শতকের গোড়ায় মালাক্কা এশীয় বাণিজ্যের একটি বড় অন্তর্বর্তী ঘাঁটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। এখানে ভারতীয়, চিন ও ইন্দোনেশিয়ার বণিকরা বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য মিলিত হত। জাহাজের মালিক ছিল মুসলমান বণিকরা। আরব ও পারস্যের বণিকেরা ক্যাম্বে থেকে জাহাজে উঠে মালাক্কায় বাণিজ্য করতে আসত। লোহিত সাগর ও মালাক্কার মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য ছিল।

ভারতীয়রা মালাক্কা থেকে লবঙ্গ, জায়ফল, ও জয়িত্রী, চীন থেকে রেশম ও পোর্সেলিনের বাসনপত্র কিনত। ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা ছিল এই অঞ্চলে। চীনারা এখান থেকে প্রচুর গোলমরিচ কিনত, একটা অংশ অবশ্যই মালাবারি উৎপন্ন পণ্য ছিল। ভারতীয় পণ্য আফিম, গন্ধদ্রব্য, চন্দন কাঠ ও মূল্যবান পাথর চীনারা কিনত। সম্ভবত চীনারা মালয়ে মসলা কেনার জন্য ভারত থেকে অস্ত্র কিনে নিয়ে যেত। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে চীন শাসকেরা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে দিলে চীনা বণিকদের ভারত মহাসাগরে দেখা যেত না। ভারতের জাহাজ গুলি উত্তর সুমাত্রার পিডি, পাসে, প্রিয়ামন, টিকু, বারোস ও সিংকেলে বাণিজ্য করতে যেত। ইন্দোনেশিয়া বণিকদের সহায়তায় ভারতীয় বণিকরা মশলা দ্বীপ এর সঙ্গে বাণিজ্য করতো। এখানকার মসলা ও ভারতীয় বস্ত্রের বিনিময় চলত। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বণিকদের উপস্থিতি ছিল বেশ জোরালো।

পশ্চিম দিকে ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্য ছিল লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে। লোহিত সাগর হয়ে ভারতীয় পণ্য আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোয় পৌঁছে যেত। আবার পারস্য উপসাগর ভারতীয় পণ্য যেত বসরা ও বাগদাদে। ষোড়শ শতকের গোড়ায় মিশরের মামলুকরা এই অঞ্চলের বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তর করেছিল। আরব ও ইয়েমেনের শহর এবং লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী আফ্রিকার শহরগুলিতে ভারতের পণ্য পৌঁছে যেত । পঞ্চদশ শতকে মিশর পশ্চিম ভারতের মধ্যে বাণিজ্য পরিচালনা করতো করিম নামের একটি বাণিজ্য সংস্থা। গুজরাটের বানিয়ারা লোহিত সাগরের তীরবর্তী বন্দর গুলির সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। কায়রোর জেনিজা দলিলের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য ছিল বহুজাতিক।পঞ্চদশ শতকের শেষে করিমদের প্রাধান্য ছিল, হিন্দু বানিয়া, মুসলমান বণিক, ইহুদি, আরমানি সকলে এই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। পারস্য উপসাগরে হর্মুজ ছিল বাণিজ্যের ঘাঁটি, সঙ্গে ছিল ওমান ও বসরা। ভারতীয় বণিক এইসব স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে ব্যবসা চালাত। পূর্ব বাণিজ্যে মালাক্কার যে ভূমিকা, পশ্চিম বাণিজ্যে হর্মুজ এর সেই

ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ভারতীয়দের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ভারতীয় বণিকরা বিক্রির জন্য এখানে নিয়ে আসতো বস্ত্র, গজদন্ত ও সোনা। এই বাণিজ্য বিবরণ প্রমাণ করে যে আরবদের সঙ্গে ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

অরবরাও ভারতীয় বণিকদের মত ভারত মহাসাগরে নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারতো। পঞ্চদশ শতকে পশ্চিম ভারতের বৃহত্তম বন্দর ক্যাম্বের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। ক্যাম্বের উত্তরাধিকারী বন্দর হল সুরাট ও দিউ। এই দুটি বন্দর লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করতো। আহম্মদনগর, বিজাপুর ও বিজয়নগর এর উদীয়মান বন্দর গুলি হল চাউল, দাভোল, গোয়া ও ভাতকল। মালাবারে ছিল কালিকট বন্দর,এখানে করিম বণিকরা এসে মিলিত হতো। এডেন ও মালাবারের মধ্যে আরব জাহাজের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। দক্ষিণ করমন্ডলে বড় বন্দর হল পুলিকট ও নেগাপত্তম। উত্তর করমন্ডলে উদীয়মান বন্দর হল মসুলিপত্তম। পঞ্চদশ শতকের শেষে বাংলার বড় বন্দর হল সাতগাঁ, চট্টগ্রাম ও শ্রীপুর। এই সময় সাতগাঁ, অবক্ষয়ের মুখে পড়েছিল। সিন্ধু দেশের লাহোরি বন্ধ ছিল বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি। এইসব বড় বন্দরের সহায়ক অনেক বন্দর ছিল, আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের চলাচলে সহায়ক হতো। ভারতের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তার সুতিবস্ত্র। সাধারণ মানের পণ্যের চাহিদা ছিল বেশি। এছাড়া ভারত থেকে রপ্তানি করা হতো চাল, ডাল, ও তেল। বাংলা, উড়িষ্যা ও কর্ণাটক ছিল খাদ্যের উদ্‌বৃত্ত অঞ্চ,। উপকূলের ঘাটতি অঞ্চল মালাবার ও সুরাটে খাদ্যশস্য পাঠানো হতো, যার বেশির ভাগ যেত মালাক্কা, হরমুজ ও এডেনে। নারকেল থেকে উৎপন্ন পণ্য, আদা, হলুদের মত পণ্য রপ্তানি তালিকায় স্থান পেত। বাংলা থেকে রপ্তানি হতো চিনি, কাঁচা রেশম, গুজরাট রপ্তানি করত কাঁচা তুলো, মালাবার রপ্তানী করত তার মসলা। গুজরাট বাংলায় তুলো পাঠাতো এবং রেশম নিত। বাংলা, করমন্ডল ও গুজরাট নীল রপ্তানি করতো। অন্যান্য ছোটখাটো পণ্য তালিকা ছিল বাংলা মোম ও লাক্ষা এবং করমন্ডল এর চামড়া। এইসব পণ্য পরিবহনে দেশি ও বিদেশি উভয় জাহাজ ব্যবহার করা হতো। ভারত বিদেশ থেকে আমদানি করত সোনা, রুপো, মালয়ের টিন, পূর্ব আফ্রিকার গজদন্ত এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের রং। মুঘল সাম্রাজ্য পারস্য উপসাগরীয় বন্দর মোখা থেকে সোনা ও রুপো আমদানি করতো। মোখাকে বলা হয়েছে 'মুঘলদের রত্নভাণ্ডার'। মুঘল মুদ্রা ব্যবস্থা এই সরবরাহের ওপর অনেক খানি নির্ভরশীল ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে উদ্‌বৃত্ত হত না, অনেক সময় ভারতকে সোনা রুপা দিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে হত।

ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য প্রধানত ভারতীয় বণিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল যদিও ইউরোপীয়রা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এই বাণিজ্য ভাগ বসিয়েছিল। কিন্তু সফল হয়নি। ইউরোপীয় জাহাজের তুলনায় ভারতীয় জাহাজের মাশুল ছিল অনেক কম। এছাড়া ভারতের জাহাজ মালিকরা নাবিক হিসেবে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেদের নিযুক্ত করতো. তাতে জাহাজ পরিচালনার সুবিধা হত তেমনি ব্যয় হত কম। জাহাজগুলি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানায়, জাহাজে অর্থ লগ্নি করে বেশি লাভ হতো না; বাণিজ্যে লগ্নি করলে তার থেকে অন্তত কুড়ি শতাংশ বেশি লাভ হত। জাহাজ বীমা করার প্রথা গড়ে ওঠেনি, পণ্য বীমার প্রথা ছিল। ভারতীয়রা জাহাজে লগ্নি করতে আগ্রহী ছিল না, ব্যতিক্রম সুরাটের মুল্লা পরিবার। সাধারণত ভারতীয় বণিকদের একটি বা দুটি জাহাজ থাকতো।

ভারতীয় বন্দরগুলির পশ্চাদভূমি হল গুজরাট, বাংলা, বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য। ভারতের উপকূল অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেছিল। গুজরাট থেকে বাংলা পর্যন্ত এই ধারা প্রবাহমান ছিল। ভারতের জাহাজ মালিক ও নাবিকেরা ছিল মুসলমান। ভারতের বণিকদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়-- ধনী বণ--, যিনি নিজের পণ্য নিয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল ধনী বণিকদের প্রতিনিধিরা যারা বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য করতেন এবং তৃতীয় স্তরে ছিল অসংখ্য ছোট ও মাঝারি বণিক যারা বিদেশে তাদের পণ্য নিয়ে যেত। ভারতের বণিকদের বেশিরভাগ ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি, তবে বন্দরে ধনিক-বণিক দেখা পাওয়া যেতো। আবদুল গফফর এর মত অতি ধনী বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করতে পারেননি। তার লোহিত সাগরের বাণিজ্যে অনেক ছোটখাটো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, বণিকদের স্বাধীনতা বজায় ছিল।

ভারতের বাণিজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো তার আয়তন ও সীমা নির্ধারণ করেছিল। সহযোগিতা ও সমঝোতা ছিল বাণিজ্য জগৎ এর মূলনীতি। ভারত মহাসাগর এর সঙ্গে যুক্ত অনেকে বন্দরের বণিক ও দালালদের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করত। এই ব্যাপারে আরব, ইরানি, ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। বণিক ও দালালরা রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ করে দিতো, আমদানি পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করত। স্রফরা সোনা অপ মুদ্রণের ব্যবস্থা করতো, বিভিন্ন টাকার বিনিময় করত। ভারতীয় বন্দরের পশ্চাদভূমি ছিল অনেক বড়, সূরাট ও হুগলির পশ্চাদভূমি ছিল সমগ্র উত্তর পশ্চিম ভারত। ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের সঙ্গে বহু শ্রেণীর মানুষ যুক্ত ছিল। স্রফ, মহাজন,, পণ্য সরবরাহকারী বণিক ও দালালরা বাণিজ্যের সংগঠনে নানাভাবে সাহায্য করতো।শুধু মূলধন থাকলে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করা যেত না, স্থানীয় সাহায্যের প্রয়োজন হত,। অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্তের মতে যেকোনো বণিক এই বাণিজ্য কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করতেন না। উৎপাদন ও সরবরাহের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হয়নি। সরকার বণিকদের ব্যাপারে সচরাচর হস্তক্ষেপ করত না, বন্দরগুলোতে শান্তি ছিল, সরকার রাজস্ব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কালিকট, গুজরাট, গোলকুণ্ডা, বিজয়নগর, বা মুঘল সাম্রাজ্য কেউই সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলনা। স্থানীয় শাসকরা বন্দর গুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিত। ভারতীয় শাসকদের কোন নৌবহর' ছিলনা, ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যপোত রক্ষার শক্তি তাদের ছিল না। প্রাদেশিক শাসকরা বাণিজ্যে অংশঃ নিয়ে তাদের সম্পদ বাড়াতেন। গোলকুণ্ডায় মীরজুমলা এবং বাংলায় শাহজাদা আজম এ ধরনের বাণিজ্য থেকে অর্থ রোজগার করেন। অনেক মুঘল অভিজাত বাণিজ্যে অর্থলগ্নি করতেন, কিন্তু বানিয়া তকমার ভয় নিজেরা বাণিজ্য করতেন না।

দেশের উৎপাদন এবং বিদেশের বাজারে উপর পণ্যের দাম নির্ভর করত। খাদ্যমূল্য অন্যান্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণে একটি বিশেষ উপাদান হিসেবে কাজ করতো। তুলো, নীল, ও রেশমের দাম বিদেশের বাজারের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই বিদেশি বাজার ছিল ক্ষুদ্রায়ত, অস্থির ও অনিশ্চিত। মহাসাগরের বাজারের অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পরিবহনের অভাব। নীলস স্টিনসগার্ড এই অস্থির, ওঠানামা বাজারের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য অবশ্যই ওঠানামা ছিল। হজের সময় পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এবং লোহিত সাগরে পণ্যের চাহিদা বেশি থাকত। রাজনৈতিক অশান্তি শুরু হলে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা কমে যেত। ভারতীয় বণিকদের ব্যবসা ছিল প্রধানত পারিবারিক। একটি ক্ষেত্রে অংশীদার নিয়ে ব্যবসা করা হতো। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যৌথ বাণিজ্য উদ্যোগ ছিল না। পারস্যে সাফাভি সাম্রাজ্য, ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজ আধিপত্য এবং চীনে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা ভারত

মহাসাগরের বাণিজ্য বড় রকমের পরিবর্তন ঘটায়নি। তুর্কিরা এডেন দখল করে লোহিত সাগরের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল, বসরা তুর্কিদের অধিকারে এসেছিল। গুজরাট ও বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। মুঘলরা স্থলপথে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। ইয়েমেন কফি বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। ষোড়শ শতকের শেষে লোহিত সাগর হয়ে উঠেছিল ভারতীয় বাণিজ্যের এক বড় ঘাঁটি। পর্তুগিজরা মালাক্কা অধিকার করলে ভারতীয় বণিকরা পশ্চিমের বাণিজ্যে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিল। ভারতের মুসলমান বণিকরা পর্তুগীজদের আধিপত্য একেবারেই পছন্দ করেনি। মালাক্কা রক্ষার চেষ্টা করে এরা ব্যর্থ হয়েছিল। অচিন ও বান্টাম থেকে তারা এই অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। হিন্দু বণিকরা পর্তুগীজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে বাণিজ্য সচল রেখেছিল। গুজরাতি বণিকরা অচিনের সঙ্গে বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল। এখানকার পণ্য তারা লোহিতসাগর অঞ্চলে নিয়ে যেত।

ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের বাণিজ্যের পরিমাণ তেমন বেশি ছিল না বলে মোরল্যান্ড তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কোন কোন পণ্যে এদের আধিপত্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে মহাসাগরের বাণিজ্য এদের আধিপত্য ছিল না। ভারতের বাণিজ্যের বেশি ভাব ছিল ভারত মহাসাগরে এবং তাতে প্রাধান্য ছিল ভারতীয়দের। তার একটি প্রধান কারণ ভারতীয়দের বাণিজ্য ব্যয় হত কম ইউরোপীয়দের তুলনায়। কর্মচারীদের সঙ্গে ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি যা তাদের বানিজ্যে পক্ষে সহায়ক হয়েছিল মুঘলরা 1632 খ্রিস্টাব্দে হুগলি থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে। পর্তুগীজদের অধীনে মালাক্কা ও হরমুজের অবক্ষয় দেখা দেয়। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকেও পর্তুগিজরা বিতাড়িত হয়েছিল ওলন্দাজ ও ইংরেজদের আগমনের ফলে পর্তুগিজ প্রভাবের অবসান ঘটে, মহাসাগরের বাণিজ্যের মুক্তি ঘটে। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। ওলন্দাজরা মসলা দ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করেছিল। ভারতীয় বণিকরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াত বন্ধ করেছিল। তারা পশ্চিমে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেছিল। পশ্চিম এশিয়ায় ভারতীয় বণিকরা প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র রপ্তানী করত। সপ্তদশ শতকের শেষে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও চীনে ভারতীয়রা যাতায়াত শুরু করেছিল। ম্যানিলা তে ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজ গিয়ে হাজির হয়। সপ্তদশ শতকে পূর্ব ভারতে সবচেয়ে বড় বন্দর ছিল মসুলিপত্তম। শিয়া বণিকরা মসুলিপত্তম ও হুগলি কে আশ্রয় করেছিল, পূর্ব ভারতে পুলিকট, নেগাপত্তম, পোর্টোনোভো ও বালাসোর ছিল অন্যান্য ব্যস্ত বন্দর। পেগু, আরাকান, তেনাসেরিম ও অচিনের সঙ্গে বাণিজ্য চলেছিল।

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য ছিল, অস্ত্র বাণিজ্য ছিল তেজী। মুঘলদের পতন, পারস্যের অবক্ষয়,, ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ,- এই বাণিজ্যের ক্ষতি করেছিল। বাংলা ও গুজরাটের বাণিজ্যের অবনতি ঘটে। গুজরাটি বণিকদের পণ্য গুদামে মজুদ হয়ে পড়েছিল। তবে লোহিত সাগরের সঙ্গে বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। গুজরাটের অবক্ষয় দেখা দেয় অষ্টাদশ শতকে। 1701খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের জাহাজের সংখ্যা ছিল ১১২, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা দিয়ে দাঁড়ায় মাত্র কুড়ি(২০)। ইংরেজদের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ঘটেছিল, চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। মাদ্রাজ পূর্ব উপকূলের বন্দর হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, মসুলিপত্তম তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে। ম্যানিলা সঙ্গে আরমানি নামের আড়ালে ইংরেজদের বাণিজ্য শুরু হয়েছিল। কলকাতা বন্দর উন্নতির পথে এগিয়ে যায়।

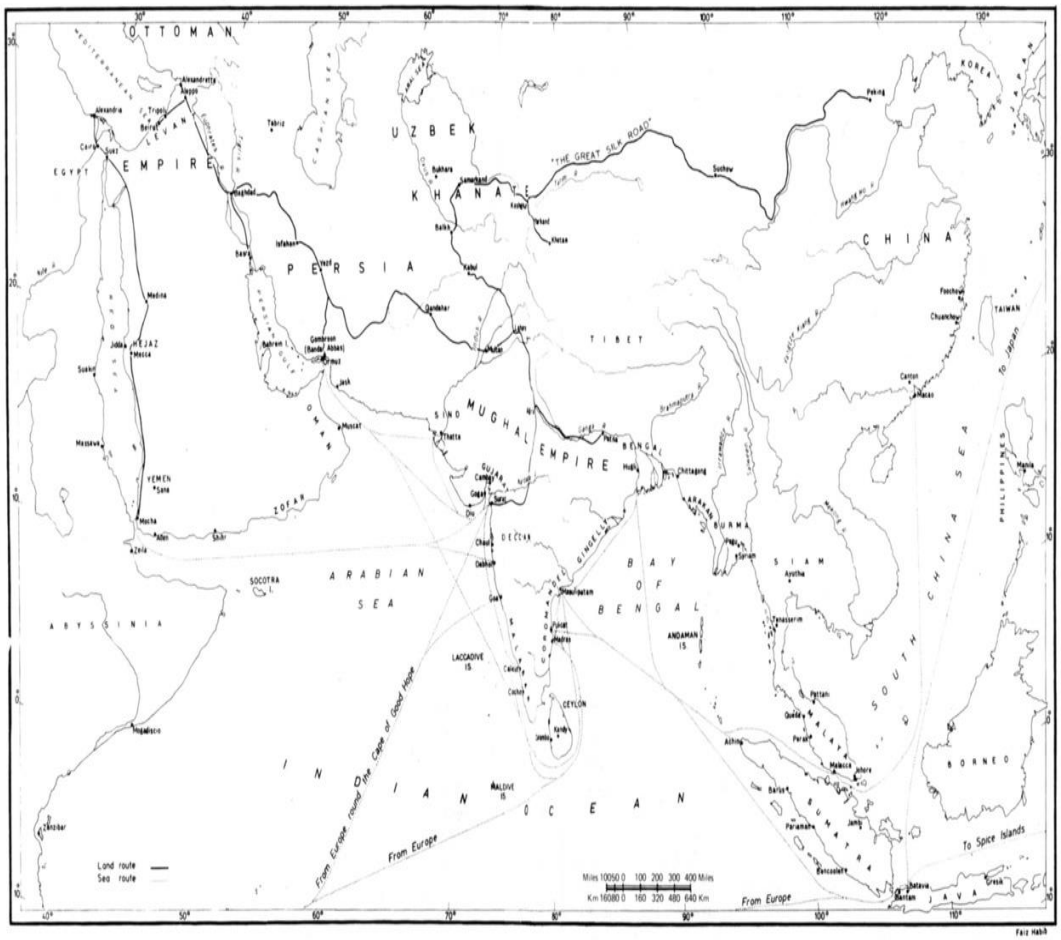

Map 10 Asia and the Indian Ocean: major trade routes and ports, seventeenth century